সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান
Campaign for Good Governance

স্বাস্থ্য সুযোগ নয়, অধিকার
স্বাস্থ্যসেবার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করতে হবে

এক

স্বাস্থ্য হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যেখানে সম্পূর্ণভাবে রোগব্যাধিমুক্ত শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক জীবন যাপন সম্ভব। স্বাস্থ্য জনগণের অধিকার এবং সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত মানব উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সূচক। স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, *"রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়: (ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা।"* এছাড়া সংবিধানের ১৮ (১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, *"জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন এবং জন স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন"*।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ধারা ২৫-এ বলা হয়েছে "স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য উপযুক্ত জীবনযাত্রার মান প্রাপ্তির অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সেবা ও সুবিধা লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই প্রাপ্য"। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির (ICESCR) অনুচ্ছেদ ১২ অনুযায়ি "প্রত্যেকের সর্বোত্তম শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য উপভোগ করার অধিকার রয়েছে।" ১৯৭৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আলমাআতা ঘোষণায় স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতাকে একটি অধিকার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং পৃথিবীর সকল দেশ তা গ্রহণ করেছে। ২০০০ সালের জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন ঘোষণায়ও এ অধিকারের বিষয়টি পূণর্ব্যক্ত করে স্বাস্থ্যকে উন্নয়নের কেন্দ্রে স্থান দেয়া হয়েছে। কিন্তু আয় এবং সম্পদে বৈষম্য, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে অসম সুযোগ ও বঞ্চনা এবং নীতিপ্রণেতাদের অমনোযোগের ফলে বাংলাদেশসহ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ আজ স্বাস্থ্য-অধিকার থেকে বঞ্চিত।

দুই

উন্নয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো মানুষের সক্ষমতা-সামর্থ্য বৃদ্ধি করা। জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসেবার উৎকর্ষতা নিশ্চিত করা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই নয় বরং তা সামাজিক ন্যায্যতা, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, নারী-পুরুষ সমতা সৃষ্টিতে প্রভাব ফেলে। ধনী-গরিব সকলের জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা তাই রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এজন্য প্রয়োজন শক্তিশালী সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা। শুধুমাত্র আর্থিক ক্ষমতা নয়, সদিচ্ছা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাই যে কোন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনার সার্থকতার মূলমন্ত্র। এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবার মূল নিয়মক রাষ্ট্র নাকি বাজারশক্তি তা নির্ধারণ করতে হবে। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার কথা উদাহরণ হিসেবে আনতে পারি। একজন মার্কিন নাগরিক চিকিৎসাসেবা পেতে পারে কেবল স্বাস্থ্যবীমা থাকলেই। বাজার শক্তি মূল নিয়ামক হওয়ায় মার্কিন সরকার তার জিডিপি'র ১৬.২% স্বাস্থ্যসেবায় ব্যয় করে থাকলেও মার্কিন আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুযায়ি চার কোটি ৬০ লাখ মার্কিন নাগরিক স্বাস্থ্যবীমা না থাকায় মৌলিক চাহিদা চিকিৎসা সেবা পায়না [১]। সেকারণে বাজারকে কোনভাবেই জনগণের স্বাস্থসেবার নির্ধারকের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। তাই আমরা স্বাস্থ্যসেবাকে বেসরকারিকরণের নামে বাজারের অধীনে নিয়ে যাওয়ার বিরোধী। কারণ তাতে গরিব ও প্রান্তিক জনগণের সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সীমিত ও অস্বীকার করা হয়। বেসরকারিকরণের অর্থ হচ্ছে বেসরকারিখাত রাষ্ট্রকে নিজেদের মুনাফা বাড়ানোর কাজে ব্যবহার এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বাজার সম্প্রসারণ ও পণ্য বিক্রির জন্য রাষ্ট্রকে ব্যবহার করা। স্বাস্থ্যব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্য নীতি যাতে দরিদ্র জনগণের জন্য সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বঞ্চনা সৃষ্টি না করে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন অধিকারের দৃষ্টিভংগির অলোকে স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন।

তিন

সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান-সুপ্র গত দু'বছর যাবত স্বাস্থ্যখাতের বাণিজ্যিকীকরণ ও বেসরকারিকরণ রোধে সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় খোঁজা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো বেশি কার্যকর ও দরিদ্র-বান্ধব প্রতিষ্ঠানে পরিণত

[১] রুবাবা আহমেদ, "তথ্য বলে দেশের মানুষের স্বাস্থ্য ভালো নেই " প্রথম আলো, ৪ নভেম্বর ২০০৯।

করার লক্ষ্যে ৩৩ টি জেলায় স্বাস্থ্যসেবা পরিস্থিতির ওপর রিপোর্ট কার্ড জরিপ, কেসস্টাডি প্রণয়ন ও পর্যালোচনা সভার আয়োজন করেছে।

জেলা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে স্বাস্থ্য খাতে প্রধানত চারটি সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে:
১) জনবল সংকট ও বৈষম্য;
২) আঞ্চলিক বৈষম্য;
৩) অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও উপকরণের অভাব;
৪) স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ব্যবস্থাপনার অভাব

১. **জনবল সংকট ও বৈষম্য:** বাংলাদেশে সরকারি চিকিৎসা সেবাখাতে চরম জনবল সংকট ও বৈষম্য বিরাজ করছে। এই সংকট চরমভাবে রয়েছে উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে। বিগত সময়ে উপজেলা পর্যায়ে হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা ৩১ থেকে ৫০, ৫০ থেকে ১০০ এবং জেলা পর্যায়ে ১০০ থেকে ২৫০ তে উন্নীত করা হলেও পর্যাপ্ত জনবল কাঠামো নিশ্চিত করা হয়নি, পুরনো জনবল দিয়েই চলছে হাসপাতালের কার্যক্রম। এরপরও অনেক পদ শূন্য রয়েছে। নিয়োগ যারা পান তাদের অনেকেই ছুটিতে বা প্রেষণে অন্য কোথাও কাজ করেন। চিকিৎসক ও নার্সদের যে ক্ষুদ্র অংশটি চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে রোগীর ভার তাদের ওপর এত বেশি যে মানসম্মত চিকিৎসা সেবা দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সবচেয়ে বেশি সংকট দেখা দেয় হাসপাতালের আউটডোরে। প্রতিদিন যে পরিমাণ রোগী আসে তাদের ঠিকমত চিকিৎসা করা তো দূরে থাক তাদের কথা শোনার মত অবস্থাও অনেক সময় চিকিৎসকদের থাকে না।

সুপ্র পরিচালিত রিপোর্ট কার্ড জরিপের তথ্য অনুযায়ী, সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে প্রতিদিন বহির্বিভাগে ৪০০-৫০০ রোগি আসেন, বিদ্যমান জনবল কাঠামোয় এদের মানসম্মত চিকিৎসা দেয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। নোয়াখালী সদর হাসপাতালে আউটডোরে রোগীদের চাপ এত বেশি যে ডাক্তারের দেখা পেতে কয়েকদিন লেগে যায়। ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ডায়াগনসিস যন্ত্রপাতি চালানোর মত দক্ষ লোকবল নেই। ১৯৬৮ সালের জনবল কাঠামো এখনও বিদ্যমান।

বরিশাল জেলা সদর হাসপাতালে ৩২ জন ডাক্তার নিয়োজিত হওয়ার কথা থাকলেও আছে মাত্র ১৪ জন। পিরোজপুর জেলা হাসপাতালে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার পদ রয়েছে ৫৩টি, বর্তমানে কর্মরত অবস্থায় আছেন ১১ জন। সার্জারি, গাইনি, মেডিসিন, শিশু, চক্ষু, ইএনটি, অর্থোপেডিক, কার্ডিওলজি এবং এনেস্থেসিওলজিস্ট কনসালটেন্ট নেই। শুধুমাত্র দাঁতের একজন কনসালটেন্ট রয়েছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তার পদ রয়েছে ২ টি, পদ দুটিই শূন্য, তৃতীয় শ্রেণীর ১০২টি পদ থাকলেও কাজ করছেন ৪৭ জন। চতুর্থ শ্রেণীর ৮৬টি পদের মধ্যে কাজ করছেন ১৯ জন। ৫০ শয্যা হাসপাতালের যে জনবল কাঠামো ছিল ১০০ শয্যার হাসপাতালে উন্নীত করার পরও তা নেই।

সরকারি হিসেবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও এর অধীন অধিদপ্তরগুলোতে ৭,০০০ চিকিৎসক সহ ২৯,০০০ পদ শুন্য রয়েছে। জনবল সংকটের আরেকটি দিক হল চিকিৎসকের সহায়তার জন্য পর্যাপ্ত নার্স ও স্বাস্থ্য সহকারির অনুপস্থিতি। বিশেষজ্ঞদের মতে মানসম্মত চিকিৎসা সেবার জন্য একজন চিকিৎসকের কাজের জন্য প্রয়োজন ৩ জন নার্স ও ৫ জন স্বাস্থ্য সহকারি (১ঃ৩ঃ৫)। বাংলাদেশে চিত্রটি এর উল্টো: ১ঃ৫৪ঃ২৭। যোগ্যতাসম্পন্ন নার্স ও স্বাস্থ্য সহকারি তৈরির উদ্যোগ খুব একটা দেখা যায়নি। এর উপর সর্বোপরি বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে জনবল কম। প্রতি ১০,০০০ মানুষের জন্য নার্স ও চিকিৎসক রয়েছে ৩ জন করে। যেখানে ভারতে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৬ ও ১৩, শ্রীলংকায় ৬ ও ১৭[২]।

২. **আঞ্চলিক বৈষম্য:** স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ি সরকারি খাতে নিয়োজিত রয়েছে ১২,৩৮২ জন চিকিৎসক ও ১৪,৩৭৭ জন নার্স। সরকারি এই চিকিৎসকরা সারা দেশে সমানভাবে ছড়িয়ে নেই। এদের বেশিরভাগেরই অবস্থান দেশের বড় শহরগুলোতে, কারণ শহরাঞ্চলে চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সুযোগ অনেক বেশি। ফলে উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে জনগণ বঞ্চিত থাকেন চিকিৎসা সেবা থেকে। আমাদের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, কুমিল্লা সদর উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীরা মাসে মাত্র একদিন ডাক্তারের দেখা পান।

[২] শিশির মোড়ল, স্বাস্থ্যখাতে জনবল-সংকট ও বৈষম্য, প্রথম আলো, ৪ নভেম্বর ২০০৯।

সরকারি স্বাস্থ্য সেবায় রয়েছে আঞ্চলিক বৈষম্য। ভৌগোলিক কারণে সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলসমূহে দরিদ্র জনগণের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে রয়েছে অনেক বাধা। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল, হাওড় অঞ্চলের নিম্নভূমি এবং উপকূল ও চরের জনগোষ্ঠীর সেবাপ্রাপ্তিতে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব একটি বড় বাধা। শরিয়তপুরের চরের জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যায় যে, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, নদী পারাপারের জন্য বিশেষ জলযান না থাকায় স্বাস্থ্যকর্মীরা অন্যত্র বদলি হয়ে যায়। শরিয়তপুর সদর হাসপাতালে **১৯** টি চিকিৎসক পদের মধ্যে **১১** টি পদ শূন্য; ৮০ টি স্বাস্থ্যকর্মী পদের মধ্যে ২০ টি শূন্য।

নেত্রকোণা শহর থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত খালিয়াজুড়ি উপজেলা। এটি একটি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দুর্গম হাওড় জনপদ। খালিয়াজুড়ি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রাতে কোন ডাক্তার, নার্স বা ওয়ার্ড বয় থাকে না। এখানকার ডাক্তার ও কর্মচারীর মোট ৭৬ টি পদের মধ্যে ৪২ টি পদ দীর্ঘদিন যাবত শূন্য। যে কয়জন ডাক্তার আছেন তারা সপ্তাহভিত্তিক পালাক্রমে উপস্থিত থাকেন। প্রায়শই মাত্র একজন চিকিৎসক দিয়ে চলছে দেড় লক্ষাধিক লোকের চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম। বর্ষাকালে হাওড় অঞ্চলে নিয়মিত যানবাহনের অভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চিকিৎসকের সেবা পাওয়া দুরহ হয়ে দাঁড়ায়। কোন কোন সময় নিকটস্থ হাসপাতাল বা চিকিৎসকের কাছে পৌঁছাতে ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত লেগে যায়। জেলার ৮৬ টি ইউনিয়নের মধ্যে ২৭ টি ইউনিয়নে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার বাধার কারণে সবচেয়ে বেশি অসুবিধার শিকার পাহাড়ের জনগণ। সরকারি স্বাস্থ্যনীতি ও বাজেট বরাদ্দে ভৌগোলিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলসমূহের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

৩. **অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও উপকরণের অভাব:** জেলা, উপজেলা ও ইউয়িন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রয়েছে উপকরণ ও যন্ত্রপাতির অভাব। প্রায় ক্ষেত্রেই হাসপাতালগুলোতে এ্যাম্বুল্যান্স থাকে অকেজো। যে পরিমাণ যন্ত্রপাতি হাসপাতালগুলোতে থাকে এগুলোতে মেরামত উপযোগী যান্ত্রিক ক্রুটি দেখা দিলেও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে তা সহজে সচল করা যায় না। যেমন নেত্রকোণা সদর হাসপাতালে এক্সরে মেশিনটি ২০/২২ বছর ধরে অচল অবস্থায় পড়ে আছে।

যশোর সদর হাসপাতালে ডেন্টাল চেয়ারটি মেরামতযোগ্য হওয়ার পরও উদ্যোগের অভাবে অচল হয়ে পড়ে আছে। একই অবস্থা সাকার মেশিন, একটি এ্যাম্বুল্যান্স ও পাঁচটি মাইক্রোস্কোপের। এ অবস্থা কমবেশি সব জেলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলায় ৫০ শয্যার হাসপাতাল ঘোষিত হলেও শয্যা রয়েছে **৩১**টি। সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের মোট শয্যা সংখ্যা থেকে প্রতিদিন গড়ে ৩০ থেকে ৪০ জন রোগী বেশি ভর্তি হয়। বিভিন্ন ওয়ার্ডে এসব রোগীকে মেঝেতে থাকতে দেখা যায়। হাসপাতালে কোন বার্ন ইউনিট না থাকায় পোড়া রোগীদেরকে সাধারণ ওয়ার্ডে থাকতে হয়। শিশু ও নারীদের রাখা হয় একই ওয়ার্ডে।

বগুড়া মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে বিকল্প বিদ্যুত সরবরাহের জন্য দুটি বৈদ্যুতিক জেনারেটর আছে। এই দুটি জেনারেটর প্রায় ৪ বছর যাবত অচল হয়ে আছে। হাসপাতালের সাতটির মধ্যে চারটি এ্যাম্বুল্যান্স অচল অবস্থায় আছে। নষ্ট হয়ে আছে তিনটি এক্সরে মেশিন। একই চিত্র বরিশাল জেলা সদর হাসপাতালেও, এখানে তিনটি এ্যাম্বুল্যান্সের মধ্যে দুটিই অচল। একটি চালু থাকলেও সেটিও যে কোন মুহূর্তে অচল হয়ে যেতে পারে। হাসপাতালে কোন হুইল চেয়ার নেই এবং নেই অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা। উত্তরাঞ্চলের গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলা হাসপাতালের এক্সরে মেশিন দশ মাস ধরে অচল, একমাত্র এ্যাম্বুল্যান্সটি সাত বছর যাবত অচল অবস্থায় পড়ে আছে।

৪. **স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ব্যবস্থাপনার অভাব :** জনবল, অবকাঠামো সংকটের বাইরে স্বাস্থ্যখাতে চরমভাবে বিরাজ করছে ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহিতার অভাব। ব্যবস্থাপনা সংকটে রয়েছে কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্র, সিদ্ধান্তগ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা, হাসপাতালে ডাক্তার ও নার্সদের সময়মত অনুপস্থিতি, হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় ফি নেয়া এবং দুর্নীতি। সরকারি হাসপাতাল থেকে রোগী ভাগিয়ে নেয়ার জন্য প্রাইভেট ক্লিনিকের দালাল চক্র, আশপাশের নানা ডায়াগনস্টিক সেন্টার। রয়েছে অকার্যকর হাসপাতাল উপদেষ্টা কমিটি, সমাজকল্যাণ তহবিলের অব্যবস্থাপনা, চিকিৎসক ও নার্সের অবহেলা। এ সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রায়শই গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এর পুরো খেসারত দিতে হয় দরিদ্র জনগণকে।

আমাদের দেশে স্বাস্থ্যতথ্যের ঘাটতি রয়েছে দুদিক থেকে। হাসপাতালে বিনামূল্যে কী কী সেবা পেতে পারে সে সম্পর্কে জনগণের সুস্পষ্ট ধারণার অভাব রয়েছে। অপরদিকে স্বাস্থ্য বিভাগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের রোগ সম্পর্কিত তথ্যমালার অভাব রয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা সুলভ ও নিশ্চিত করার জন্য তথ্যের আধুনিকায়ন ও ডাটাবেইজ তৈরি প্রয়োজন এবং সকল জনগণের জন্য স্বাস্থ্য কার্ড প্রচলনের উদ্যোগ নিতে হবে।

চার

জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্য একটি অবহেলিত খাত । ২০০৯-১০ অর্থবছরে সরকারের মোট বাজেট বরাদ্দ ৯৯,৯৬২ কোটি টাকা। এর মধ্যে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ হচ্ছে ৬,০৯২ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৫.৯%। শুধুমাত্র প্রজনন স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্যই প্রতিবছর ৯% বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন। ২০১৫ সালের মধ্যে এমডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা নিশ্চিত করতে হলে সরকারকে জাতীয় বাজেটের ১০-১২% স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ দেয়া উচিৎ। শুধু তাই নয়, স্বাস্থ্য খাতে মোট বাজেটের ৫০%এর বেশি অর্থ ব্যয় হয় কর্মচারিদের বেতন ভাতা ও প্রশাসনিক খাতে। এই কারণে স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। এছাড়া স্বাস্থ্য খাতে উন্নত প্রযুক্তি ক্রয়ে বিনিয়োগ প্রায় শূন্যের কোঠায়।

গত ৬ বছরের জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে গড় বরাদ্দ ৬.২৪% যা গড়ে আমাদের মোট জিডিপি'র মাত্র ১%। ফলে স্বাস্থ্য খাতে জনপ্রতি প্রতি বছর সরকারি খরচ হয়েছে গড়ে মাত্র ১২ মার্কিন ডলার। ২০০০ সালের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে আমাদের জনপ্রতি ন্যূনতম খরচ বলা হয়েছিল ১২ মার্কিন ডলার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, জনপ্রতি স্বাস্থ্য বাবদ আমাদের ন্যূনতম খরচ হওয়া উচিত ৩৪ মার্কিন ডলার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে জিডিপি'র ৫% বরাদ্দ করা হলে মাঝারি মানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালানো যেতে পারে।

পাঁচ

বিশ্বব্যাংকের ঋণ এবং বাংলাদেশে স্বাস্থ্যনীতির সংস্কার: প্রায় দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে উন্নয়নশীল দেশসমূহ বিশ্বব্যাংক নির্দেশিত পথেই স্বাস্থ্যনীতির সংস্কার করে আসছে। এ সংস্কারের উদ্দেশ্য দুটি:

১. স্বাস্থ্যনীতি এবং সেবাসমূহকে বেসরকারি দখলে নিয়ে যাওয়া, এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে দায়িত্ব থেকে মুক্ত করা। স্বাস্থ্যের দায়িত্ব হবে মূলত: বেসরকারি খাতের।
২. জনস্বাস্থ্যে সরকারি ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে স্বাস্থ্যনীতি এবং অগ্রাধিকারসমূহের সাথে আর্থিক সামঞ্জস্য বিধান । বিশ্বব্যাংকের যুক্তি হল, জনস্বাস্থ্যে ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশসমূহ দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক দাতাদের কাছ থেকে নেয়া বৈদেশিক ঋণের কিস্তি পরিশোধে সুবিধা হবে[৩]।

১৯৮০ সাল থেকে সূচিত কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি (Structural Adjustment Program-SAP) 'র পরামর্শসমূহের আলোকে স্বাস্থ্যনীতির সংস্কার নির্দেশিত হয়েছে । বিশ্বব্যাংক নির্দেশিত স্বাস্থ্য সংস্কারের এই প্যাকেজ অনেক উন্নয়নশীল দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশেষভাবে ঋণ-সাহায্যগ্রহীতা দেশসমূহকে শর্তযুক্ত ঋণ সাহায্যর মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাস্থ্যনীতির সংস্কার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছে[৪]। কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি'র তিনটি প্রধান উপাদান হলো: সরকারের আকার ছোট করা, অর্থনৈতিক উদারীকরণ এবং আর্থিক কর্মকান্ডের বেসরকারীকরণ যা বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশসমূহে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ভংগুর ও অস্থিতিশীল করেছে। বিশ্বব্যাংকের স্বাস্থ্যখাত সম্পর্কিত সংস্কারের ৪টি প্রধান দিক রয়েছে:

১. স্বাস্থ্যখাতে বীমার সূচনা
২. স্বাস্থ্যসেবার জন্য ফি নেয়া (User Fees for Health Services)
৩. স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রিকরণ
৪. স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে বেসরকারিখাত এবং এনজিওদের ভূমিকা জোরদার করা[৫]।

বিশ্বব্যাংকের বেসরকারী খাতে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনার দুটি প্রধান সমালোচনা হল, বিশ্বব্যাংক এই সংস্কার প্যাকেজ প্রণয়ন করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারী ব্যবস্থাপনার (American Model of Private Managed Care) ওপর ভিত্তি করে। আমেরিকার স্বাস্থ্য মডেল বড় ইন্টারেস্ট গ্রুপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেখানে এর মূল্যবোধের প্রধান ভিত্তি প্রতিযোগিতা এবং মুক্ত বাজার। তিনটি প্রধান নিয়ামক- Private Care Organizations, ইন্সুরেন্স কোম্পানি এবং ফার্মাসিউটিকেল কোম্পানি স্বাস্থ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। যেখানে সেবা নয়, বর্ধিত মুনাফা অর্জনই এদের প্রধান লক্ষ্য। যুক্তরাষ্ট্রে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে দরিদ্র মানুষের বঞ্চনা সর্বজনবিদিত।

---

[৩] Mohammed Nuruzzaman, Health Policy Reforms and the Poor in the Global South, Department of Political Science, University of Alberta

[৪] Laurell, Asa Cristina and Oliva Lopez Arellano, Market Commodities and Poor Releif: The World Bank Proposal for Health, 2002

[৫] The World Bank, Health Policy Reforms and the Poor, Dr. Mohammed Nuruzzaman, Department of Political Science, University of Alberta

দ্বিতীয় সমালোচনাটি হল, বিশ্বব্যাংকের স্বাস্থ্যসেবার বেসরকারীকরণ এপ্রোচে ১৯৭৮ সালের আলমা-আতা ঘোষণার মূল চেতনা-কমিউনিটি ভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের গুরুত্বকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। আলমা-আতা ঘোষণা সকল রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত, যেখানে স্বাস্থ্যকে একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। শুরু থেকেই যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কয়েকটি সংগঠন বিশেষ করে -রকফেলার ফাউন্ডেশন, ফোর্ড ফাউন্ডেশন এবং পপুলেশন কাউন্সিল কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উদ্যোগকে ব্যয়বহুল, অবাস্তবায়নযোগ্য প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগে গেল। এই সংগঠনসমূহ আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় না নিয়ে cost effitive পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যসেবার অগ্রাধিকার নির্ণয়ে গুরুত্বারোপ করল[৬]।

উন্নয়নশীল দেশসমূহে দেশের ভেতর একটি শক্তিশালী গ্রুপ যেমন ক্লিনিক এবং হাসপাতাল ব্যবসায়ী, সরকারি সিদ্ধান্ত প্রণেতা এবং ব্যবসায়ী ধনকুবের যারা বিশালাকারে স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগে আগ্রহী, স্বাস্থ্যবীমা কোম্পানি লবি এবং মেডিকেল সাপ্লাই সংক্রান্ত গ্রুপ ব্যবসায়িক স্বার্থে বিশ্বব্যাংকের নির্দেশিত ধারায় স্বাস্থ্যনীতি সংস্কারে আগ্রহী।

বাংলাদেশ সহ উন্নয়নশীল দেশসমূহ ঋণ-সাহায্যের শর্তের বেড়াজালে স্বাস্থ্যখাতের বিশ্বব্যাংক মডেল গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।'৮০ সাল থেকে সূচিত কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি (Structural Adjustment Program) এবং বর্ধিত কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচির (Enhanced Structural Adjustment Facility-ESAF) নীতি-পরামর্শ এবং ঋণ-সাহায্যের কারণে এ বাধ্যবাধকতা আসে। বিশ্বব্যাপি স্বাস্থ্যখাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ওপর বিশ্বব্যাংক-ই এখন প্রধান শক্তি। '৯০ দশকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুদানের পরিমাণ প্রায় ৯০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার, যেখানে বিশ্বব্যাংকের স্বাস্থ্যখাতে ঋণের পরিমাণ ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৬ সালে বেড়ে দাড়িয়েছে ১.১৬ বিলিয়ন থেকে ২.৩৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক আধিপত্যের কারণে বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে জাতিসংঘের সকল প্রতিষ্ঠান- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাংক নির্দেশিত মডেলে অর্থায়ন করছে। ঋণের শর্তের মাধ্যমেই এ মডেল আমাদের মত দেশগুলোর ওপর চাপানো হচ্ছে[৭]।

বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার "স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সেক্টরের (HNPSP)" আওতায় ৮ বছর মেয়াদের ৩৭৩৮৪.১১ কোটি টাকা ব্যয়ে সংশোধিত HNPSP বাস্তবায়ন করছে[৮]। প্রধানতঃ বিশ্বব্যাংকের আই. ডি. এ. ও অন্যান্য দাতাগোষ্ঠির ঋণ-সাহায্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। বৈদেশিক ঋণে পরিচালিত এ প্রকল্পের প্রথম পর্যায় ছিল ২০০৩-২০০৬ পর্যন্ত। প্রথম পর্যায়ের সফলতা নিয়ে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন "তা থেকে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যায়নি"। এ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য দেশের চলমান ন্যূনতম স্বাস্থ্য সুবিধাটুকুকে অর্থের বিনিময়ে ক্রয়যোগ্য পণ্যে রূপান্তর করা। এ কর্মসূচিতে স্বাস্থ্যের সামাজিক উপাদান -পরিবেশ দূষণ রোধ ও উন্নয়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ যানবাহন, নিরাপদ খাদ্য ও পানীয়, ঘাটতিজনিত সমস্যা, স্যানিটেশন প্রভৃতি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে[৯]।

HNPSP কার্যক্রম মূল্যায়ন কাজে নিয়োজিত স্বাধীন পর্যালোচনা টিমের মূল্যায়নে বলা হয়েছে- তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে HNPSP ব্যর্থ হয়েছে। এগুলো হলো-কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং সংগ্রহ। স্বাধীন পর্যালোচনা টিমের ভাষায় "এ মুহূর্তে HNPSP কে গুরুতর অসুস্থ রোগীর সংঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে যার নিবিড় পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে যা ছাড়া এটি অন্তিম পর্যায়ের অসুস্থ রোগীতে পরিণত হবে"[১০]।

লক্ষণীয় বিষয় হলো হাজার হাজার কোটি টাকার এ কর্মসূচি প্রণয়নে জনগণকে কোনভাবেই সম্পৃক্ত করা হয় নাই। এ সম্পর্কিত কোন জনবিতর্ক-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় নাই। ঋণ-সাহায্যের পেছনে ক্রিয়াশীল স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠির নির্দেশে ও সিদ্ধান্তে এ কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের ঋণের অর্থায়নে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে পরিচালিত ব্যর্থ প্রকল্পের দায়ভার কে নেবে?

---

[৬] Mohammed Nuruzzaman, Health Policy Reforms and the Poor in the Global South, Department of Political Science, University of Alberta

[7] The World Bank, Health Policy Reforms and the Poor, Dr. Mohammed Nuruzzaman, Department of Political Science, University of Alberta

[৮] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ২০০৯-১০, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[৯] ডা. আব্দুল মতিন, জাতীয় স্বাস্থ্যবাজেট : প্রেক্ষাপট স্বাস্থ্য অধিকার, বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিকার আন্দোলন কর্তৃক ০৭ এপ্রিল ২০০৮ এ আয়োজিত আলোচনা সভায় পেশকৃত।

[১০] বাংলাদেশের অর্থনীতি পর্যালোচনা ২০০৭-০৮, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ারগ (সিপিডি)

বর্তমানে বাংলাদেশে কোন চূড়ান্ত স্বাস্থ্যনীতি নেই। গত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৩ আগস্ট ২০০৮ জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির হালনাগাদ প্রস্তুত করে। এর ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার এ বছর জুলাই মাসে একটি খসড়া স্বাস্থ্যনীতি মতামতের জন্য প্রস্তুত করে। স্বাস্থ্যনীতির সংস্কার HNPSP এর আওতায় বিশ্বব্যাংকের আইডিএ ঋণের মাধ্যমে পরিচালিত একটি চলমান প্রকল্প। সরকারের প্রস্তাবিত খসড়ানীতিতে প্রাইভেট সেক্টরের ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের ঋণের আওতায় প্রণীত এই খসড়া স্বাস্থ্যনীতি এ ধারণার উপর প্রণীত হয়েছে যে, "যাদের সামর্থ্য আছে তারা বাজার থেকে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কিনবে এবং যাদের সামর্থ্য নেই বাজার থেকে স্বাস্থ্যসেবা কেনার সরকার তাদের জন্য বেসরকারিখাতের সাথে চুক্তি করবে"। সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের এ এ্যাপ্রোচ বিশ্বব্যাপি দূর্বল ও অকার্যকর প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান খসড়া স্বাস্থ্যনীতিতে এ ধারণার সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। প্রস্তাবিত এ খসড়া স্বাস্থ্যনীতি বিশ্বব্যাংক নির্দেশিত স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বাজার চালিত মডেলকে (Market Model) রাষ্ট্রীয় মডেলের (State Model) ওপর স্থান দেয়ার ইঙ্গিত প্রদান করে। স্বাস্থ্যখাত সংস্কারের আওতায় খরচের অংশীদারিত্বের নামে রোগীদের কাছ থেকে ফী (Users Fee) নেয়ার পরও তা সরকারী হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধিতে কোন ভূমিকা পালন করতে পারেনি। স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বাজারচালিত সংস্কার স্বাস্থ্যসেবা লাভে ধনী-গরিব ব্যবধান-পার্থক্যকে আরো ব্যাপক করবে। দরিদ্রদের স্বাস্থ্যসেবা লাভের এখনো পর্যন্ত যে সুযোগ রয়েছে ক্রমান্বয়ে তাও নি:শেষ হবে।

স্বাস্থ্যনীতিকে ঘিরে সুপ্র'র দাবিগুলো হচ্ছে

১. স্বাস্থ্যখাতে ডাক্তার-নার্স সহ সকল শূন্য পদে অবিলম্বে নিয়োগ প্রদান করতে হবে, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে জনবল সংকট ও বৈষম্য নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে
২. সকল পর্যায়ে সরকারি বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ রাখার পরিকল্পনা রাখতে হবে, না থাকলে রেফারেল ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে
৩. ঝুঁকিপূর্ণ দূর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোর জন্য বিশেষ চিকিৎসক টিম এবং বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে
৪. সকল জনগণের জন্য স্বাস্থ্য কার্ড প্রচলনের উদ্যোগ নিতে হবে
৫. জিডিপি'র ৫% অর্থ স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ দিতে হবে
৬. স্বাস্থ্যকে মৌলিক অধিকার হিসাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে
৭. ঋণ-সাহায্যের শর্তের আওতার বাইরে স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করতে হবে
৮. জনগণের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। স্বাস্থ্য সেবার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করতে হবে
৯. সকল উপজেলা পর্যায়ে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং বিদ্যমান ডাক্তারের সংখ্যা দ্বিগুণ করতে হবে
১০. প্রাইভেট ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সরকারি পরিবীক্ষণের আওতায় আনতে হবে
১১. জাতীয় ঔষধ নীতিমালার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানহীন ঔষধ আমদানি বন্ধ ও দেশীয় ঔষধ শিল্পকে রক্ষা করতে হবে
১২. জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া স্বাস্থ্য নীতি চূড়ান্তকরণ বন্ধ করতে হবে এবং সরকারী স্বাস্থ্যসেবা বেসরকারীকরণের প্রচেষ্টা বন্ধ করতে হবে।

সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র)
৮/১৯, স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭
ফোন : ৯১৪৫৬০০, ফ্যাক্স: ৯১৩৯৭৯০
ই-মেইল: info@supro.org
ওয়েবসাইট: www.supro.org

খসড়া জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০০৯
সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান- সুপ্র'র সুপারিশ ও মতামত

সকলের জন্য সম-সুযোগ সম্পন্ন মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে

সাধারণ সুপারিশমালা ও মতামতসমূহ

১. স্বাস্থ্যনীতিকে বাংলায় ওয়েবসাইটে প্রকাশের মাধ্যমে জনগণের মতামত গ্রহণের উদ্যোগ প্রশংসনীয়

২. সকল রাজনৈতিক দল, চিকিৎক পেশাজীবি সংগঠন, নাগরিক সমাজ, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে প্রণীত স্বাস্থ্যনীতি জাতীয় সংসদে আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা উচিৎ

৩. বর্তমান খসড়া স্বাস্থ্যনীতিটি বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রণীত খসড়া স্বাস্থ্যনীতিরই ধারাবাহিকতা। স্বাস্থ্যনীতির সংস্কার বিশ্বব্যাংকের (আই. ডি. এ) ঋণের আওতায় পরিচালিত একটি চলমান প্রকল্প। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০০৯-১০ এর মধ্যে এইচএনপিএসপির আওতায় এটি একটি চলতি প্রকল্প (৩৮ নং, পৃষ্ঠা ৩৩০, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০০৯-১০)। স্বাধীন-সার্বভৌম জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করতে হবে, বিশ্বব্যাংকের ঋণের আওতায় স্বাস্থ্যনীতির সংস্কার নয়।

৪. বিশ্বব্যাংকের ঋণের আওতায় প্রণীত এই খসড়া স্বাস্থ্যনীতি এ ধারণার উপর প্রণীত হয়েছে যে, "যাদের সামর্থ্য আছে তারা বাজার থেকে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কিনবে এবং যাদের সামর্থ্য নেই বাজার থেকে স্বাস্থ্যসেবা কেনার সরকার তাদের জন্য বেসরকারিখাতের সাথে চুক্তি করবে"। সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের এ এ্যাপ্রোচ বিশ্বব্যাপি দূর্বল ও অকার্যকর প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান খসড়া স্বাস্থ্যনীতিতে এ ধারণার সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। এ ধারণা থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূখ্য ভূমিকায় রাখতে হবে।

৫. বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে সেবা প্রদানে বিভিন্ন দূর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এ নীতিমালায় বেসরকারিখাতের সংস্কার না করেই স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সরকারি স্বাস্থ্যসেবাকে কোনভাবেই সংকোচন, বেসরকারিকরণ বা বাণিজ্যিকীকরণের উদ্যোগ নেওয়া যাবে না। মুনাফা নয়, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠাই হবে স্বাস্থ্যনীতির মূল দৃষ্টিভঙ্গি।

৬. বর্তমান নির্বাচিত সরকারের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নির্বাচনী অঙ্গীকারসমূহ স্বাস্থ্যনীতিতে প্রতিফলন দেখতে চাই। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অঙ্গীকারসমূহ হল:
২০২১ সালের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য দৈনিক ন্যূনতম ২১২২ কিলো ক্যালোরির উর্ধ্বে খাদ্য, সংক্রামক ব্যাধি সম্পূর্ণ নির্মূল, সকলের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, ২০১৩ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন, ২০২১ সালের মধ্যে গড় আয়ুষ্কাল ৭০-এর কোঠায় উন্নীত, শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার কমানো প্রভৃতি নিশ্চিত করা হবে। এ ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট লক্ষ্যসমূহ হল:

- ২০১১ সালের মধ্যে দেশের সকল মানুষের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা হবে।
- ২০১৩ সালের মধ্যে প্রতিটি বাড়িকে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে।
- ২০২১ সালের মধ্যে দেশের ৮৫ শতাংশ নাগরিকের মানসম্পন্ন পুষ্টি চাহিদা পূরণ নিশ্চিত হবে।
- ২০২১ সালের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিদিন ন্যূনতম ২১২২ কিলো ক্যালোরির উর্ধ্বে খাদ্যনিশ্চিত করা হবে।
- ২০২১ সালের মধ্যে সকল প্রকার সংক্রামক ব্যাধি সম্পূর্ণ নির্মূল করা হবে।
- ২০২১ সালে গড় আয়ুষ্কাল ৭০-এর কোঠায় উন্নীত করা হবে।
- ২০২১ সালে শিশুমৃত্যুর হার বর্তমান হাজারে ৫৪ থেকে কমিয়ে ১৫ করা হবে।
- ২০২১ সালে মাতৃমৃত্যুর হার ৩.৮ থেকে কমে হবে ১.৫ শতাংশ।
- ২০২১ সালে প্রজনন নিয়ন্ত্রণ ব্যবহারের হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করা হবে ।

এই লক্ষ্যসমূহের ভিত্তিতে স্বাস্থ্যনীতি প্রণীত হতে হবে এবং এর ভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্যসমূহ স্বাস্থ্যনীতিতে সুস্পষ্ট করতে হবে ।

৭. খসড়া স্বাস্থ্যনীতির উপক্রমণিকায় বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা পরিস্থিতি, স্বাস্থ্যখাতের অগ্রগতির প্রতিবন্ধকতা, জনমিতিক বৈশিষ্ট্য ও জনগণের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন, মানবসম্পদ, ব্যবস্থাপনা ও গবেষণার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এর আলোকে দূরদৃষ্টি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতিসমূহ ও কৌশলসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে যা সম্পূর্ণভাবে সমাঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উপক্রমণিকায় যে সমস্যাসমূহের কথা বলা হয়েছে সকল সমস্যার সমাধানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নীতি-কৌশলে উল্লেখ করা হয় নি। তাছাড়া যে সুনির্দিষ্ট ১৫টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে সে অনুযায়ী কৌশল নির্ধারণ করা হয় নি। যেমন পঞ্চদশ -এ উল্লেখ করা হয়েছে ”চিকিৎসার জন্য বিদেশ গমনের প্রয়োজনীতাকে সীমিত করা হবে”- কিন্তু কিভাবে হবে সে সম্পর্কে নীতি-কৌশলে সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই।

৮. কৌশল ও নীতিমালাসমূহ সাধারণভাবে বলা হলেও বাস্তবায়ন কৌশলের কোন ইংগিত নেই। যেমন- কৌশলে বিভিন্ন জায়গায় “জোরদার করা হবে, গুরুত্বারোপ করা হবে, ব্যবস্থা করা, উদ্যোগ নেওয়া হবে” কিন্তু কিভাবে, কত সময়ের মধ্যে হবে সে সম্পর্কিত সময়-নির্দিষ্ট এবং পরিমাপযোগ্য কোন মানদন্ড নেই। সময়-নির্দিষ্ট এবং পরিমাপযোগ্য কোন মানদন্ড থাকতে হবে।

৯. স্বাস্থ্য সুযোগ নয়; অধিকার। মুনাফা নয়, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠাই হবে স্বাস্থ্যনীতির মূল দৃষ্টিভঙ্গি- এ বিষয়ে সুস্পষ্ট লক্ষ্যমাত্রা, মানদন্ড সময় উল্লেখসহ সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

১০. স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পর্যাপ্ত গবেষণার আলোকে স্বাস্থ্যখাতের লক্ষ্যমাত্রা ও মানদন্ড নির্ধারণ করতে হবে।

১১. নীতিমালা বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত জনবল আছে কিনা এবং না থাকলে কী ব্যবস্থা নেয়া হবে তার উল্লেখ থাকতে হবে।

১২. এ নীতিমালা বাস্তবায়নে কোন ধরণের ব্যবস্থাপনা সংস্কার প্রয়োজন তা উল্লেখ থাকতে হবে

সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা ও মতামতসমূহ

	খসড়া 'জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০০৯' থেকে গৃহীত	**সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা ও মতামতসমূহ**
১	উপক্রমনিকা	উপক্রমণিকায় আরো যেসব বিষয় সংযুক্ত হতে পারে ১. জনগণের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ২. জনবল সংকট, শূন্যপদ বা অনুপস্থিত (৬০% চিকিৎসকের পদ খালি সেইসাথে নার্স, প্যারামেডিকস্ ও অন্যান্য প্রচুর পদ খালি আছে যা উপক্রমণিকায় উল্লেখ থাকা উচিৎ) ৩. অবকাঠামো ও উপকরণ সংকট ৪. আঞ্চলিক বৈষম্য-পার্বত্যাঞ্চল, চর, হাওড়, উপকূল এবং দূর্গমঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবা পরিস্থিতি ৫. স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বরাদ্দ বিশ্লষণ এবং এর ব্যয়ের ধরণ ৬. সরকারি হাসপাতালে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এর অভাব, অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি বর্ণনার পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে পরিবীক্ষণের অভাব ৭. বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টার-এর দুনীতি এবং সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে এর প্রভাব ৮. সরকারি হাসপাতালের বিন্যাস প্রশাসনিক অনুপাতে বিন্যস্ত, জনসংখ্যার অনুপাতে নয়
	দূরদৃষ্টি	স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকার শুধু সাংবিধানিক মূলনীতি হিসাবে নয়, মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে
	লক্ষ্য	দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সাথে "প্রান্তিক" জনগোষ্ঠীর উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
	সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সমূহ	সুনির্দিষ্ট যে ১৫টি লক্ষসমূহ আছে তার আলোকে নীতি-কৌশলসমূহ বিন্যস্ত হওয়া উচিৎ
	কৌশলসমূহ ১০. দরিদ্র জনগণের নিরাপত্তা বেষ্টনী যথাযথভাবে নিশ্চিত করে সকল সরকারি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে "সেবা গ্রহীতা ফি" সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার জন্য একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং এ জন্য একটি নির্দেশিকা তৈরী করা হবে। ১১. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয়খাতে বিদ্যমান জনশক্তির মান উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। চাহিদা যাচাই করে সরকারি ও বেসরকারি খাতে অতিরিক্ত জনশক্তি (ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস্, টেকনোলজিষ্ট প্রভৃতি) তৈরির জন্য পদক্ষেপ নেয়া হবে।	১০. দরিদ্র জনগণকে (৪০% দারিদ্র্যসীমার নীচে জনগণ) "সেবা গ্রহীতা ফি" থেকে বাইরে রাখতে হবে। সকল দরিদ্র জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান করতে হবে। ১১. জনশক্তি ঘাটতির পরিমাণ উল্লেখ থাকলে ভাল হতো, চাহিদা যাচাই-এর জন্য গবেষণার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। স্বাস্থ্যকর্মীদের হালনাগাদ তথ্য উল্লেখ থাকা দরকার। নার্সের পদ বাড়াতে হবে। হাসপাতাল উপদেষ্টা কমিটির কাজ সচল করতে হবে

	খসড়া 'জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০০৯' থেকে গৃহীত	সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা ও মতামতসমূহ
	১৯. সরকারি হাসপাতাল/সেবা কেন্দ্রসমূহে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অধীনে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাকটিসের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখা হবে।	**১৯.** সরকারি হাসপাতাল/সেবা কেন্দ্র সমূহে কোনভাবেই প্রাতিষ্ঠানিক প্রাকটিসের সুযোগ রাখা যাবে না।
	২০. প্রয়োজন অনুযায়ী ডাক্তারি পরামর্শ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেবার ফি পর্যালোচনা ও নিয়ন্ত্রণ করা হবে। বিনামূল্যে চিকিৎসা লাভে যোগ্য রোগীদের মধ্যে সরকারি হাসপাতালের সেবা নিশ্চিতকল্পে চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহে সক্ষম রোগীদের জন্য বেসরকারি খাতের বিনিয়োগে বিশেষজ্ঞ ও বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ সেবার নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার, বিশেষত: ঢাকার বাইরে উদ্যোগকে সরকার উৎসাহিত করবে।	**২০.** উপজেলা পর্যায়ে সরকারি বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ রাখার পরিকল্পনা রাখতে হবে, না থাকলে রেফারেল ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে।
	২১. সরকারি খাতের কর্মকান্ডকে সহায়তা করার লক্ষ্যে এবং এর পরিপূরক হিসেবে বেসরকারি খাতে স্বাস্থ্য সেবার প্রসারকে উৎসাহিত করার ধারা অব্যাহত রাখা হবে। --প্রাইভেট ক্লিনিক ও ডায়গনস্টিক সেন্টার পরিচালনার বর্তমান বিধি-বিধানসমূহ কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে।	**২১.** "সরকারি খাতের কর্মকান্ডকে সহায়তা করার লক্ষ্যে এবং এর পরিপূরক হিসেবে বেসরকারি খাতে স্বাস্থ্য সেবার প্রসারকে উৎসাহিত করার ধারা অব্যাহত রাখা হবে" -এ অংশটি বাদ দিতে হবে । স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সরকারিখাতকেই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে। বেসরকারী হাসপাতালগুলোকেও সরকারী হাসপাতালের ন্যায় "সেবা গ্রহীতা ফি" নিয়ে আউটডোর চালু করতে হবে । কঠোরভাবে কীভাবে প্রয়োগ করা হবে তা উল্লেখ থাকলে ভাল হতো
	৩০. অসংক্রামক রোগের কারণে সৃষ্ট অসুস্থতা ও অকাল মৃত্যু হ্রাস করার জন্য সমন্বিত উপায়ে প্রাথমিক প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের সকল পর্যায়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারিখাতের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সরকার প্রধান প্রধান অসংক্রামক রোগ যেমনঃ হৃদরোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, প্রভৃতি সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি, চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যগ্রহণ ও জীবনধারা নিয়ন্ত্রণে কাজ করবে। দরিদ্রদের মধ্যে অধিক প্রাদুর্ভাবমূলক সাধারণ অসংক্রামক রোগ যেমনঃ উচ্চ রক্তচাপ, হাঁপানী ও অন্ধত্ব নির্মূলে সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সকলের জন্য স্বাস্থ্য সেবা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সকল অসংক্রামক রোগের	**৩০.১** অংশীদারিত্বের ধরণ সুস্পষ্ট করতে হবে এবং চিকিৎসা সেবা প্রদান-এর দায়িত্ব প্রধানত: সরকারের হাতে রাখতে হবে, অংশগ্রহণের নামে কোনভাবেই সরকারিখাতকে দূর্বল করা যাবে না। ৩০.২ জোরদার এবং আরও সম্প্রসারণ কীভাবে করা হবে তা সময় উল্লেখসহ সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

	খসড়া 'জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০০৯' থেকে গৃহীত	সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা ও মতামতসমূহ
	বিদ্যমান প্রতিরোধ ও নিরাময়মূলক সেবা জোরদার এবং আরও সম্প্রসারণ করা হবে। ৩১. সংক্রামক রোগ যেমনঃ শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ, ডায়রিয়া, ডেঙ্গু, প্রভৃতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের বর্তমান কর্মসূচি জোরদার ও আরও সম্প্রসারণ করা হবে। ৩২. সহিংসতা, আঘাত, ---সমস্যার জন্য অনান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ সমূহ, গণমাধ্যম ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে সমন্বিত ------যে সকল সেবা কেন্দ্রে এসব চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, সেখানে সেবার সুযোগ সৃষ্টি করে বর্তমানের পরামর্শ ও চিকিৎসা সেবার গুনগত মান ও পরিমান সম্প্রসারিত করা হবে। ৩৬. জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট রোগ-ব্যাধির বোঝা কমিয়ে আনতে একটি জাতীয় কর্মসূচির রূপরেখা তৈরি করা হবে। ৩৭. অনিরাপদ পানি পান এবং অস্বাস্থ্যকর ও নিম্নমানের খাবার থেকে স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয় বিধায় মূল্যায়ন ও আদর্শমান বজায় রাখার জন্য সুনির্দিষ্ট খাদ্যমান নির্ধারণ করা হবে। ৪৫. জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের বরাদ্দ বর্তমানের প্রায় ৭ শতাংশ থেকে পর্যায়ক্রমে আনুপাতিক হারে যথাযথ পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।	৩১. জোরদার এবং আরও সম্প্রসারণ কীভাবে করা হবে তা সময় উল্লেখসহ সুনির্দিষ্ট করতে হবে। ৩২. পরামর্শ ও চিকিৎসা সেবার গুনগত মান ও পরিমান সম্প্রসারিত করার বিষয়টি সময় উল্লেখসহ সুনির্দিষ্ট করতে হবে । ৩৬. জাতীয় কর্মসূচির রূপরেখা তৈরি করার সময় উল্লেখ করতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ দূর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোর জন্য বিশেষ চিকিৎসক টিম এবং বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে। ৩৭. সুনির্দিষ্ট খাদ্যমান নির্ধারণের সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে। ৪৫. ৭ শতাংশ হার থেকে পর্যায়ক্রমে আনুপাতিক হারে যথাযথ পর্যায়ে- এই শব্দসমূহ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করতে হবে। স্বাস্থ্যখাতে জিডিপি'র ৫% বরাদ্দ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। **স্বাস্থ্য বাজেট সম্পূর্ণ আলাদা করতে হবে; বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দ থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর বাজেট আলাদা করে স্বাস্থ্যখাতের বাজেট বরাদ্দ সুস্পষ্ট করতে হবে।**
	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	• সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের ভিত্তিতে পাঁচ বছর পর পর স্বাস্থ্যনীতি হালনাগাদ করতে হবে • পরিবীক্ষণ মূল্যায়নে পেশাজীবি, গবেষক এবং নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণের সুযোগ রাখতে হবে • প্রতিবছর পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন প্রতিবেদন জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে